ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

সার-সংক্ষেপ*

২১ অক্টোবর ২০১৯

* ২০১৯ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রকাশিত প্রাথমিক প্রতিবেদনের ওপর ৩১ মার্চের পরে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে হালনাগাদকৃত সার-সংক্ষেপ।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা দল
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
জুলিয়েট রোজেটি, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
তাসলিমা আক্তার, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
কুমার বিশ্বজিৎ দাস, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
নাজমুল হুদা মিনা, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

মাঠ পর্যায়ে তত্ত্বাবধান
জাফর সাদেক চৌধুরী, মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, মো. আলী হোসেন, মো. খোরশেদ আলম, মো. মনিরুল ইসলাম জাহিদ, মো. গোলাম মোস্তফা

তথ্য সংগ্রহকারী
সাগর মুখার্জী, মো. মমিন ভূঁইয়া, মোছা. ছাবেতুন নেছা, মোশাররফ হোসেন, মো. হাবিবুল্লাহ হায়দার, এ কে এম নাঈম, জোবেদা আক্তার, মো. মঈন উদ্দীন, মো. রিপন মিয়া, মো. নাসির উদ্দিন লিংকন, মো. সোহেল রানা সুইট, মিতু আক্তার, রায়হান এইচ মিল্টন, মো. রেজাউল মোল্লা, মো. সালমান, প্রজীব হালদার, মো. মনিরুল ইসলাম, মো. জেনাউর রহমান সাঈদ, সুবোধ চন্দ্র দাস, মো. ইকবাল হোসেন, মাহমুদুল হাসান, কে. এম. জহিরুল ইসলাম, রবিউল হোসেন, আরিফুর রহমান, শুভ কুমার বিশ্বাস, জ্যোতির্ময় রায়, মো. মেহেদী হাসান, মুহসিনা মেহনাজ, রেখা আক্তার, গাজী সালাউদ্দিন, নাজিয়া আরেফিন, মো. এনামুল হক, মো. আব্দুল গাফফার, ইন্দ্রজিত কুমার রাজবংশী, শাওন হোসাইন, মো. আরিফুল ইসলাম, বশির আহমেদ, মো. মোক্তাদিরুল ইসলাম, অনন্যা নাহার চৈতি, সুশীল কান্তি চাকমা, মো. হাফিজুর সরদার, মিরা খাতুন, মো. আল আমিন ভূঁইয়া, মো. আবু সালেহ, হারুন অর রশিদ মামুন, আশরাফুল মোবারক, আবদুল হাকিম, আতিকুর রহমান, রাজিয়া সুলতানা, পল্টু কুমার রায়, মো. নূর-আলম

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
সব মুখ্য তথ্যদাতা যারা তাঁদের মূল্যবান সময় ও মতামত দিয়ে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। খসড়া কার্যপত্র পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

সার-সংক্ষেপ

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সুশাসন ও শুদ্ধাচার গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত, যার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এ ধরনের নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকলেও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকাও এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ। এসব অংশীজনের মধ্যে রয়েছে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীসহ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ, ক্ষমতাসীন দল/ জোট, বিরোধী রাজনৈতিক দল/ জোট, প্রার্থী, নাগরিক সমাজ, সংবাদ-মাধ্যম ও নির্বাচন পর্যবেক্ষক।

২০০৭ ও ২০০৯ সালে টিআইবি'র গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের আইন-বহির্ভূত উপায়ের আশ্রয় নেওয়া এবং নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি বিভিন্ন পর্যায়ে লঙ্ঘনের প্রবণতা রয়েছে। সম্প্রতি ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর সম্পন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল হওয়ার পর প্রথম নির্বাচন যেখানে সবগুলো রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু জাতীয় সংসদের একটি প্রধান কাজ সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা। নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয় বলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করাও একইরকম গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর টিআইবি'র পূর্ববর্তী গবেষণার ধারাবাহিকতায় একাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও আওতা

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া কতটুকু সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও আইনানুগ তা পর্যালোচনা করা। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে -

১. একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও প্রার্থী, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন অংশীজন নির্বাচনী প্রক্রিয়া কতটুকু আইনানুগভাবে অনুসরণ করেছেন তা পর্যালোচনা করা;
২. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ প্রাক্কলন করা; এবং
৩. নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রধান অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

এ গবেষণার আওতার মধ্যে রয়েছে নির্বাচন-পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও অন্যান্য অংশীজনের নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড), নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, এবং নির্বাচনের পরবর্তী একমাস পর্যন্ত তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ।

৩. গবেষণার পদ্ধতি

এ গবেষণায় গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এসব পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে আধেয় বিশ্লেষণ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ, এবং ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাবাচক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়া পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বাছাইকৃত আসনের বাছাইকৃত প্রার্থীদের কার্যক্রমের ওপর পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকা নির্ধারণ ও নমুনায়ন: প্রথমে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৩০০টি আসন থেকে ৫০টি আসন নির্বাচন করা হয়েছে। এরপর প্রত্যেক আসনে প্রধান দুটি দল/ জোটের প্রার্থী বাছাই করে প্রার্থী ও তাদের কার্যক্রমের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কোনো আসনে স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে তৃতীয় কোনো শক্তিশালী প্রার্থী থাকলে তাকেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে গবেষণায় মোট ১০৭ জন প্রার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব আসন থেকে প্রত্যক্ষ তথ্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ অন্যান্য নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইবুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিক ও ভোটারদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে।

নভেম্বর ২০১৮ থেকে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৩১ মার্চেও পরে সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪. গবেষণাভুক্ত নির্বাচনী আসনের তথ্য

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসন নয়টি বিভাগের ৪৫টি জেলায় বিস্তৃত। ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি ১১টি আসন (২২%) রয়েছে, এর পরেই রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে নয়টি (১৮%)। সবচেয়ে কম আসন রয়েছে সিলেট ও বরিশাল বিভাগে (চারটি করে)।

চিত্র ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসন যেসব জেলায় রয়েছে

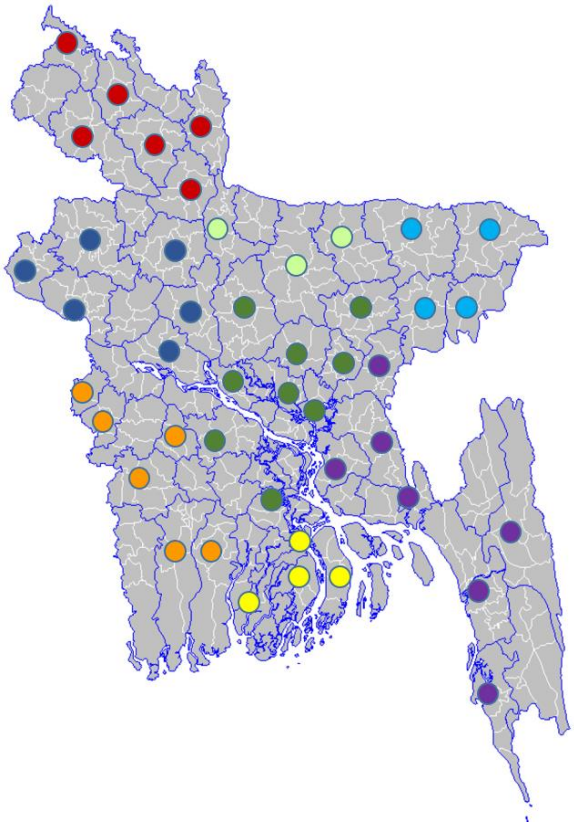

উল্লেখ্য, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে মোট ভোটার ১,৬৮,৭৬,৬৭৪ জন, এবং এদের মধ্যে নারী ভোটার ৮৩,৭৫,৩১৮ জন (৪৯.৬৩%)। এসব আসনে চূড়ান্ত মনোনয়নপ্রাপ্ত মোট প্রার্থী ২৯৭ জন; আসনপ্রতি গড়ে ৫.৯৪ জন।

সারণি ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ও সারা দেশের প্রার্থীদের তথ্য

	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থী	২৯৯ আসনে মোট প্রার্থী
মোট প্রার্থী	১০৭ জন (নারী ৫, পুরুষ ১০২)	১,৮৬১ জন (নারী ৬৯, পুরুষ ১,৭৯২)
দলীয় পরিচিতি	আওয়ামী লীগ ৪১, বিএনপি ৪৩, জাতীয় পার্টি ৮, গণ ফোরাম ৫, স্বতন্ত্র ৩, অন্যান্য ৭	আওয়ামী লীগ ২৬১, বিএনপি ২৭২, জাতীয় পার্টি ১৭৫, গণ ফোরাম ২৭, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২৯৮, স্বতন্ত্র ১২৮, অন্যান্য ৭০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্নাতকোত্তর বা তদূর্ধ্ব ৪৬%, স্নাতক ৩৮%, উচ্চ মাধ্যমিক ৯.৩%, অন্যান্য ৬.৭%	স্নাতকোত্তর ৩৩.৪%, স্নাতক ৩৪.৪%, উচ্চ মাধ্যমিক ১১.৪%, মাধ্যমিক ৩.৩%, অন্যান্য ১৬.৬%*
পেশা	ব্যবসায়ী ৫৩.৩%, আইনজীবী ১৩%, শিক্ষক ৬.৫%, চিকিৎসক ৫.৬%, অন্যান্য ২১.৬%	ব্যবসায়ী ৬২%, আইনজীবী ১০%, কৃষিজীবী ৫%, শিক্ষক ২%, অন্যান্য ২২%*
গড় মাসিক আয়	৬,২৬,৫৯১ টাকা	তথ্য পাওয়া যায় নি

* ২৮৬টি আসনে কেবল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জোটের প্রার্থীদের ওপর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী। তথ্যসূত্র: *ডেইলি স্টার*, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে নারী ৫ জন ও পুরুষ ১০২ জন। তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৪১, বিএনপি'র ৪৩, জাতীয় পার্টির ৮, গণ ফোরামের ৫, স্বতন্ত্র ৩, এবং অন্যান্য ৭ জন। এসব প্রার্থীর মধ্যে স্নাতকোত্তর বা তদূর্ধ্ব ৪৬%, স্নাতক ৩৮%,

উচ্চ মাধ্যমিক ৯.৩%, এবং অন্যান্য ৬.৭%। প্রার্থীদের ৫৩.৩% ব্যবসায়ী, ১৩% আইনজীবী, ৬.৫% শিক্ষক, ৫.৬% চিকিৎসক, এবং ২১.৬% অন্যান্য পেশার। প্রার্থীদের গড় মাসিক আয় ৬,২৬,৫৯১ টাকা।

৫. নির্বাচনী প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে তিনটি ধাপে ভাগ করা যায় - প্রাক-নির্বাচনী সময়, নির্বাচনকালীন সময় ও নির্বাচন-পরবর্তী সময়। প্রত্যেক ধাপেই নির্দিষ্ট কয়েকটি কার্যক্রম রয়েছে, যার একটি বড় অংশ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে এই প্রক্রিয়ায় সরকারসহ অন্যান্য অংশীজনেরও গুরুপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরবর্তী অংশে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের কার্যক্রমের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চিত্র ২: নির্বাচনী প্রক্রিয়া

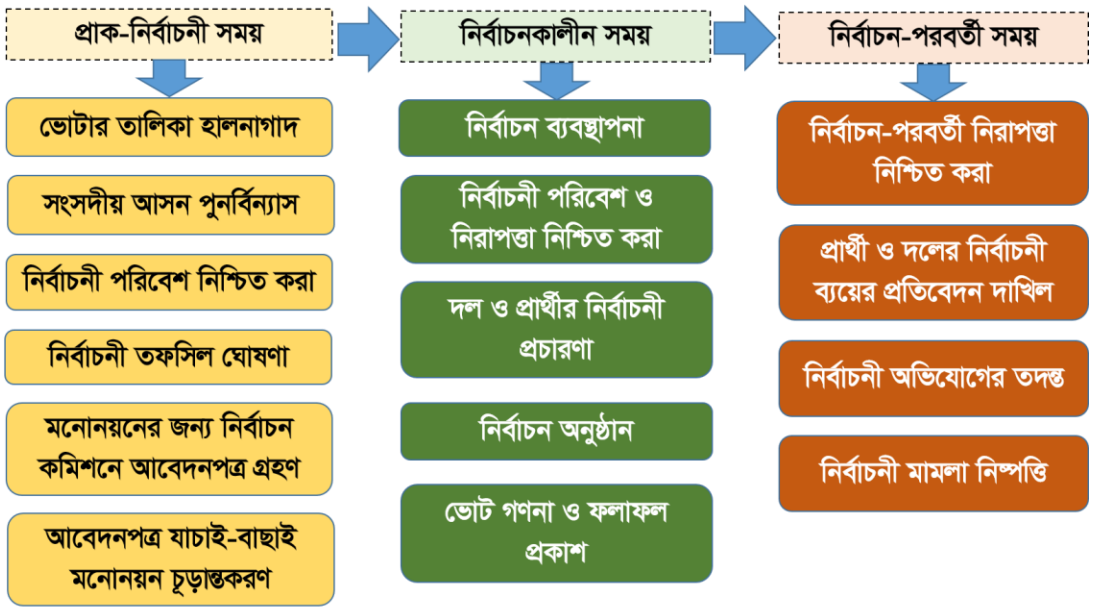

৫.১. প্রাক-নির্বাচনী সময়

৫.১.১. ভোটার তালিকা হালনাগাদ

২০১৭ সালের জুলাই থেকে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু করে নির্বাচন কমিশন। এ প্রক্রিয়ায় ২০১৭ সালে ৩৩.৩২ লাখ নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এবং ১৭.৪৮ লাখ মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে অপসারণ করা হয়। সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী সারা দেশে মোট ভোটার ১০ কোটি ৪২ লাখ ৩৮ হাজার ৬৭৭ জন, যার মধ্যে নারী ভোটার ৪৯.৫৭%, এবং পুরুষ ভোটার ৫০.৪৩%। ভোটার তালিকা হালনাগাদের প্রক্রিয়া যথাযথ থাকলেও প্রত্যেক বাড়িতে না যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

৫.১.২. সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে ৩৮টি আসনের সীমানা পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৪টি আসনের জনসংখ্যা জেলার গড় জনসংখ্যার চেয়ে ২৫% কম বা বেশি দেখা যায়, এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৬২টি আসন ভারসাম্যহীন লক্ষ করা যায়। পরে ৫৫টি আসনের সীমানা নিয়ে ৬৫১টি আপিল উত্থাপন করা হয় সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য ও ভোটারদের পক্ষ থেকে - এর মধ্যে ৪০৭টি আপিল নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ও ২৪৪টি পক্ষে ছিল। আপত্তির ওপর শুনানি শেষে চূড়ান্তভাবে ২৪টি আসনের সীমানা পরিবর্তন করা হয়, এবং ২০১৮ সালের মে মাসে গেজেট প্রকাশ করা হয়।

৫.১.৩. নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২০১৭ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ, এবং সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করা হয় ও তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রায় ৪৫০ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রধান আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন, সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচন, নিরপেক্ষ সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন, 'না' ভোটের পুনঃপ্রচলন, ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। নিরপেক্ষ সরকার, সেনা মোতায়েন, সীমানা পরিবর্তন, ইভিএম ব্যবহার নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মতামত ছিল পরস্পরবিরোধী। এসব প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তার আওতার মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাব পূরণের অঙ্গীকার

করে। তবে সেনাবাহিনীকে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার সরকারের ওপর বলা হলেও সরকারের কাছে প্রেরণ করার উদ্যোগ নেয় নি নির্বাচন কমিশন।

২০১৮ সালে নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশন আবেদন আহবান করে। ৭৬টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করলেও যাচাই-বাছাই করে নির্বাচন কমিশন কোনোটিকেই নিবন্ধন দেয় নি।

অধিকাংশ দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইভিএম কেনার উদ্যোগ নেয় নির্বাচন কমিশন। সরকারের পক্ষ থেকে প্রকল্প পাস হওয়ার আগেই ২০১৮ সালের জুন মাসে ২,৫৩৫টি ইভিএম কেনা হয়। পরে অক্টোবর মাসে ইভিএম ব্যবহারে মন্ত্রিসভার অনুমোদন পাওয়া যায়, এবং ইভিএম ব্যবহার সংক্রান্ত ধারা সংযোজন করে অধ্যাদেশ জারি করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আইনের সংশোধন করা হয়।

সব দলের অংশগ্রহণ করার সাপেক্ষে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'অংশগ্রহণমূলক' করার ওপর বিভিন্ন অংশীজনের পক্ষ থেকে জোর দেওয়া হলেও 'রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপের প্রয়োজন নেই', এবং 'নির্বাচনী পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে' বলে নির্বাচন কমিশন অভিমত প্রকাশ করে। ইতোমধ্যে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হয় ২০১৮ সালের প্রায় শুরু থেকেই। অন্যদিকে ২০১৮ সালের জুন-জুলাই মাস থেকে সরকারবিরোধী দলের বিশেষকরে বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করার ধারা শুরু হয়। অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত সারা দেশে ৪,১৩৫টি মামলায় ৩ লাখ ৬০ হাজার ৩১৪ জন ব্যক্তিকে আসামি করা হয়, যাদের মধ্যে গ্রেফতার করা হয় ৪,৬৫০ জনকে। মূলত বিএনপি'র নেতা-কর্মী ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের এজেন্ট, এবং কমিটি ধরে ধরে মামলার আসামি করার অভিযোগ উত্থাপিত হয় বিএনপি'র পক্ষ থেকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরানো মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটনা না ঘটলেও এসব মামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়, যেগুলো 'গায়েবি মামলা' বলে পরিচিত। দেখা যায়, অনেকক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি বা ঘটনার সময় অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া সভা-সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও বৈষম্য করা হয়। তবে এ ধরনের কার্যক্রমের পরও 'নির্বাচনী পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে' বলে সরকারের পক্ষ থেকেও অভিমত প্রকাশ করা হয়।

২০১৮ সালের অক্টোবরে ৭ দফা দাবি নিয়ে মূলধারার কয়েকটি দলের সমন্বয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করা হয়। এসব দলের মধ্যে বিএনপি, গণফোরাম, জেএসডি, কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগ ও নাগরিক ঐক্য অন্তর্ভুক্ত। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টসহ অন্যান্য দল ও জোটের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন দাবির মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারের পদত্যাগ, জাতীয় সংসদ বাতিল, আলোচনা করে নিরপেক্ষ সরকার গঠন; নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন ও নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার না করা; বাক, ব্যক্তি, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সব রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; নির্বাচনের ১০ দিন আগে থেকে নির্বাচনের পর সরকার গঠন পর্যন্ত বিচারিক ক্ষমতাসহ সেনাবাহিনী মোতায়েন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া; নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা ও সম্পূর্ণ নির্বাচনপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে তাদের ওপর কোনো ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ না করা, গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করা; এবং তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত চলমান সব রাজনৈতিক মামলা স্থগিত রাখা ও নতুন কোনো মামলা না দেওয়া উল্লেখযোগ্য।

নির্বাচন কমিশনের কোনো উদ্যোগ ছাড়াই ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর সরকারের সাথে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সংলাপ হয়, যেখানে সরকার ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানানো হয় ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে। কোনো দাবি মেনে না নিলেও প্রধানমন্ত্রী নতুন কোনো মামলা না দেওয়া ও গ্রেফতার না করা, এবং সভা-সমাবেশ করতে বাধা না দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। নির্বাচনের আগে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথেও ক্ষমতাসীন দলের সংলাপ হয়, তবে সার্বিকভাবে নির্বাচনকালীন সরকারের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। তবে চূড়ান্তভাবে প্রধান সরকারবিরোধী দলগুলো একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

৫.১.৪. নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা

নির্বাচন কমিশন ২০১৮ সালের ৮ নভেম্বর প্রথম তফসিল ঘোষণা করে। এই তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯ নভেম্বর, প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৯ নভেম্বর ও নির্বাচন ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮। তবে এই তফসিল অনুযায়ী প্রচারণার সময় ২৩ দিন রাখা হয় যা বিদ্যমান আইনের পরিপন্থী। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের কারণে সংশোধিত তফসিল ঘোষণা করা হয় ১২ নভেম্বর। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০১৮ সালের ২৬ নভেম্বর, প্রত্যাহারের শেষ দিন ৯ ডিসেম্বর ও নির্বাচন ৩০ ডিসেম্বর।

তফসিল ঘোষণার পর সবগুলো নিবন্ধিত দল তাদের দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করে। এই মনোনয়ন ফরম বিতরণ ঘিরে মিছিল, মনোনয়ন-প্রত্যাশীদের শো-ডাউনের ফলে যানজট সৃষ্টি হয়, এবং একটি আসনে একটি দলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে দুইজনের মৃত্যু হয়। মনোনয়ন-প্রত্যাশীদের শো-ডাউনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত দলগুলোর প্রতি নির্বাচন কমিশন নমনীয় মনোভাব দেখালেও বিএনপি'র বিরুদ্ধে 'আচরণ বিধি লঙ্ঘন' বলে অভিযোগ করে, এবং বিএনপি'র বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা

গ্রহণ করে। তফসিল ঘোষণার পরেও বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার অব্যাহত ছিল। নির্বাচন কমিশনকে বিএনপি'র পক্ষ থেকে ২,০৪৭টি মামলার তালিকা দেওয়া হয়। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অনুরোধ করা হলেও মামলা প্রত্যাহার ও গ্রেফতার বন্ধে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি।

অন্যদিকে তফসিল ঘোষণার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই ক্ষমতাসীন জোট/ দলের মনোনয়ন-প্রত্যাশী প্রার্থীদের প্রচারণা চলমান ছিল। কোনো কোনো আসনে বিরোধী দলের প্রার্থীদেরও প্রচারণা লক্ষ করা যায়। তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ৫২ জন প্রার্থী গড়ে ২ লাখ ৬৯ হাজার ৮৭ টাকা ব্যয় করেছেন বলে দেখা যায়। এর মধ্যে একটি আসনে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৮২ লাখ ৫৭ হাজার টাকা, এবং আরেকটি আসনে একজন প্রার্থী সর্বনিম্ন ২,৯৮৫ টাকা ব্যয় করেন।

৫.১.৫. মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ

বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। নির্ধারিত সময়ে মোট আবেদনকারী প্রার্থী ছিলেন ৩,০৬৫ জন। এর মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ক্ষমতাসীন দলের হয়ে মনোনয়ন পান; এ বিষয়ে সিইসি তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করতে ব্যর্থ হন।

যাচাই-বাছাইয়ের পর নির্বাচন কমিশন ২,২৭৯ জনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করে, এবং ৭৮৬ জনের মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করে, যার মধ্যে আওয়ামী লীগের তিনজন ও বিএনপি'র ১৪১ জন। এর আগের নির্বাচনগুলোর তুলনায় সবচেয়ে বেশি মনোনয়ন বাতিল হয়েছে বলে দেখা যায়। মনোনয়ন বাতিলের জন্য মূল কারণ ছিল ঋণ খেলাপি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকা। তবে বাতিলের জন্য একই মানদণ্ডে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। পরে নির্বাচন কমিশনে শুনানির পর ২৩৪ জনের মধ্যে ২০২ জনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে উচ্চ আদালতের রায়ে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পরও সরকারবিরোধী দলের ২৩ জনের প্রার্থিতা বাতিল হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে তিনজন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হয়।

একটি আসনে একজন প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ার কারণে ২৯৯টি আসনে চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১,৮৬১ জন, অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ৩৯টি এবং জোট ৫টি। দেখা যায় কোনো দলেই তৃণমূলের সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনয়ন দেওয়ার প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় নি, বরং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সব প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়।

দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের চারজন নির্বাচনে সম্ভাব্য ব্যয় ও ব্যয়ের উৎস সম্পর্কে হলফনামায় তথ্য দেন নি। তিনজন প্রার্থী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত সম্ভাব্য ব্যয় দেখিয়েছেন (সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত)। আরও দেখা যায় তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ১০৫ জন প্রার্থীর গড়ে ২,১০,৭৬০ টাকা ব্যয় (সর্বোচ্চ ১৪,৬৮,০০০ টাকা, সর্বনিম্ন ৩৭,৫০০ টাকা); উল্লেখযোগ্য খাত পোস্টার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, জন-সংযোগ ইত্যাদি

৫.২. নির্বাচনকালীন সময়

৫.২.১. নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মোট বাজেট ছিল ৭০০ কোটি টাকা। নির্বাচন কমিশন ৯ নভেম্বর ৬৬ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দেন, যাদের ৬৪ জন ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং দুইজন বিভাগীয় প্রশাসক। অন্যান্য নির্বাচন কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ৫৮২ জন, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ৪০,১৮৩ জন, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ২,০৭,৩১২ জন, এবং পোলিং কর্মকর্তা ৪,১৪,৬২৪ জন।

নির্বাচনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য মোট ৬,০৮,০০০ জন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যকে নিয়োজিত করা হয়। এদের মধ্যে পুলিশ ১,২১,০০০ জন, আনসার ৪,৪৬,০০০ জন, গ্রাম পুলিশ ৪১,০০০ জন, র‍্যাব ৬০০ প্লাটুন, বিজিবি ৯৮৩ প্লাটুন, সেনাবাহিনী ৪১৪ প্লাটুন, ৪৮ প্লাটুন নেভি, এবং কোস্টগার্ড ৩০ প্লাটুন। প্রত্যেক কেন্দ্রে এক থেকে দুইজন পুলিশ ও ১২ জন আনসার সদস্য নিয়োজিত ছিল। ২৪ ডিসেম্বর থেকে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনা মোতায়েন করা হয়।

নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম ঠেকানোর জন্য প্রত্যেক আসনে যুগ্ম জেলা জজ ও সহকারী জজের সমন্বয়ে ১২২টি নির্বাচন তদন্ত দল গঠন করা হয় ২৫ নভেম্বর। তদারকি ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১,৩৮২ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ৬৪০ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য স্থানীয় ৮১টি পর্যবেক্ষক সংস্থাকে অনুমতি দেওয়া হয়। নির্বাচনে স্থানীয় পর্যবেক্ষক ছিলেন ২৫,৯০০ জন, বিদেশী পর্যবেক্ষক ৩৮ জন, বৈদেশিক মিশন কর্মকর্তা ৬৪ জন, এবং বৈদেশিক মিশনে কর্মরত বাংলাদেশি পর্যবেক্ষক ৬১ জন। তবে পর্যবেক্ষক সংস্থার অনুমোদনে একই মানদণ্ড অনুসরণ না করার অভিযোগ ছিল

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। বিরোধিদলীয় রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বেশ কয়েকটি দেশি ও বিদেশী পর্যবেক্ষক সংস্থাকে অনুমোদন দেওয়া না হলেও কয়েকটি পর্যবেক্ষক সংস্থা ক্ষমতাসীন দলের সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও অনুমোদন পায়। এছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ উদ্যোগের ঘাটতির ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষকরা উপস্থিত থাকতে পারে নি।

তবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও ১০ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৬ জেলার ১৪৯টি আসনে প্রায় ২৫০টি সংঘাতের ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু ঘটে, এবং ১,১৬০ জন আহত হন। এসব ঘটনায় সাতজন প্রার্থীসহ ৭৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তফসিল ঘোষণার পর থেকে সরকারবিরোধী দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারও অব্যাহত ছিল - ৮ নভেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ১১,৫৮৬ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

৫.২.২. নির্বাচনী প্রচারণা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো আসনে প্রচারণার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলকে এককভাবে সক্রিয় দেখা যায়। কোনো কোনো আসনে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে সরাসরি প্রচারণার জন্য সুবিধা আদায়, প্রশাসন/আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মচারী কর্তৃক প্রার্থীর প্রচারণায় অংশগ্রহণ, সরকারি সম্পদ ব্যবহার করে প্রচারণা করা হয়েছে বলে লক্ষ করা যায়।

অন্যদিকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৮৮% আসনে (১২% আসনের তথ্য পাওয়া নি) সরকারবিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকেই দলীয় নেতা-কর্মীদের নামে মামলা, পুলিশ/ প্রশাসন কর্তৃক হুমকি/ হয়রানি, প্রার্থী/ নেতা-কর্মী গ্রেফতার অব্যাহত ছিল। এসব আসনে ১২,৬৮৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, যাদের মধ্যে ৩,৭৩৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী ও কর্মী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ভয়-ভীতি দেখানো, গ্রেফতার হওয়া ও মামলা থাকার কারণে বিরোধী দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীরা প্রচারণা চালাতে ব্যর্থ হন।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩৮% আসনে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিপক্ষ দলের প্রার্থীদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে মারামারি, সরকারবিরোধী দলের প্রার্থীর সমর্থক ও নেতা-কর্মীদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, হামলা, নির্বাচনী ক্যাম্প ভাঙচুর করা, পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭২% আসনে বিরোধীদলের প্রচারে বাধা দেওয়া হয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো (১০০%) আসনেই প্রার্থীদের কোনো না কোনো আচরণ বিধি লঙ্ঘন হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ধরনের মধ্যে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড প্রতি একাধিক ক্যাম্প স্থাপন, মটরসাইকেল নিয়ে শোডাউন, নির্ধারিত সময়ের (দুপুর ২টা - রাত ৮টা) বাইরে প্রচারণা চালানো, দেওয়ালে ও যানবাহনে পোস্টার ও লিফলেট লাগানো, পোস্টারে মুদ্রণ সংখ্যা, প্রেস/প্রিন্টার্সের নাম, ফোন নম্বর না দেওয়া, আলোকসজ্জা, প্রার্থীর ছবি ও প্রতীকসহ টি-শার্ট/ব্যান্ডানা/ক্যাপ পরিধান, প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রার্থীর প্রচারণায় প্রকাশ্যে বাধা দেওয়া (মিছিল/জনসভা করতে না দেওয়া, পোস্টার টাঙাতে না দেওয়া/ছিঁড়ে ফেলা, মাইকিং করতে না দেওয়া/ মাইক ভেঙ্গে ফেলা) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (সারণি ২ দ্রষ্টব্য)। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৮% আসনে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের কারণে প্রশাসন কর্তৃক প্রার্থী/ সমর্থক/কর্মীদের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। বাকি আসনগুলোতে প্রশাসন/আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করে কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় নি বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। কয়েকটি আসনের কোনো কোনো প্রার্থী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন বলে জানা যায়।

সারণি ২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে উল্লেখযোগ্য আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ধরন

আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ধরন	আওয়ামী লীগ (%)	জাতীয় পার্টি (%)	বিএনপি (%)	গণফোরাম (%)	অন্যান্য (%)	মোট প্রার্থী (%)
জনসভা বা শোভাযাত্রা (যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন ইত্যাদি)	৯৫.১	৮৭.৫	৩০.৬	৪০	৫৭.১	৫৮.৮৮
দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন ইত্যাদিতে পোস্টার লাগানো	৮০.৫	৭৫	৪৪.৪	৪০	৫৭.১	৫৭.০১
নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারকে পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন, বকশিশ ইত্যাদি প্রদান	৭০.৭	৭৫	৪৪.৪	২০	৪২.৯	৫১.৪০
পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা	৬৩.৪	৫০	৪৭.২	২০	৪২.৯	৪৭.৬৬
প্রতি ইউনিয়নে এবং পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক ক্যাম্প/অফিস স্থাপন	৮২.৯	৫০	১৯.৪	২০	২৮.৬	৪৪.৮৬
ভোটের তিন সপ্তাহ আগে প্রচারণা	৬৫.৯	২৫	২৭.৮	৪০	৫৭.১	৪২.০৬
মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখবিহীন পোস্টার	৬৩.৪	২৫	৩০.৬	২০	২৮.৬	৩৯.২৫
'দুপুর দুইটা থেকে রাত আটটা'র বাইরে মাইক্রোফোন ব্যবহার	৬৩.৪	৬২.৫	২২.২	০	২৮.৬	৩৮.৩২
মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল কিংবা শো-ডাউন	৬১	২৫	২৭.৮	২০	২৮.৬	৩৭.৩৮

আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ধরন	আওয়ামী লীগ (%)	জাতীয় পার্টি (%)	বিএনপি (%)	গণফোরাম (%)	অন্যান্য (%)	মোট প্রার্থী (%)
প্রতিপক্ষের পথসভা, ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযানে বাধা	৭৮	৫০	২.৮	২০	২৮.৬	৩৭.৩৮
প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক বক্তব্য বা প্রার্থীর ছবি/ চিহ্ন সংবলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার	৬১	৩৭.৫	১৩.৯	০	২৮.৬	৩২.৭১
৪০০ বর্গফুটের বেশি আয়তনের প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা	৫৬.১	৩৭.৫	১৩.৯	২০	২৮.৬	৩১.৭৮
গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ	৬৫.৯	১২.৫	৮.৩	০	১৪.৩	২৯.৯১
যেকোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো	৪৩.৯	৩৭.৫	১৬.৭	০	৫৭.১	২৮.৯৭
পথসভা বা মঞ্চ তৈরি করে জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি	৪৮.৮	৬২.৫	৫.৬	০	২৮.৬	২৭.১০
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় তিন মিটারের বেশি নির্বাচনী প্রতীক	৫৮.৫	৩৭.৫	০	০	২৮.৬	২৭.১০
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার বা লিফলেট ইত্যাদির ওপর অন্য প্রার্থীর পোস্টার বা লিফলেট লাগানো এবং কোনো ধরনের ক্ষতিসাধন	৪১.৫	৫০	১৩.৯	২০	২৮.৬	২৭.১০
ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয়	৫৩.৭	৩৭.৫	৮.৩	০	১৪.৩	২৭.১০
ব্যক্তিগত চরিত্র হনন, তিক্ত বা উস্কানিমূলক বক্তব্য, লিঙ্গ বা সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এ ধরনের বক্তব্য দান	৩৯	৩৭.৫	১৩.৯	২০	২৮.৬	২৫.২৩
অনভিপ্রেত গোলোযোগ বা উচ্ছৃংখল আচরণ দ্বারা শান্তি ভঙ্গ	৪৮.৮	২৫	৫.৬	২০	২৮.৬	২৫.২৩
প্রার্থীর পক্ষে সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও কোনো সরকারি কর্মকর্তার নির্বাচনী প্রচারণা বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	৫৩.৭	২৫	৮.৩	০	০	২৫.২৩

মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ১০৪ জন প্রার্থী গড়ে ৭,৪৯৫,৩৮৮ টাকা ব্যয় করেছেন বলে দেখা যায়। এর মধ্যে একটি আসনে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৪ কোটি ৫০ লাখ ৪৮ হাজার ৫০০ টাকা, এবং আরেকটি আসনে একজন প্রার্থী সর্বনিম্ন ২,৫০০ টাকা ব্যয় করেছেন বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৫৭.৯% প্রার্থী।

সার্বিকভাবে তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় ৭৭ লাখ ৬৫ হাজার ৮৫ টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্ধারিত ব্যয়সীমার (আসনপ্রতি সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা) তিনগুণের বেশি (সারণি ৩ দ্রষ্টব্য)। তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৫৮.৯% প্রার্থী। সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা (গড়ে পাঁচগুণের বেশি), এবং সবচেয়ে কম ব্যয় করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাত হচ্ছে পোস্টার, নির্বাচনী ক্যাম্প, জনসভা, এবং কর্মীদের জন্য ব্যয়।

সারণি ৩: তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যন্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় (প্রাক্কলিত)

রাজনৈতিক দল	প্রার্থীর সংখ্যা	তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যন্ত প্রচারণার জন্য প্রার্থীদের মোট গড় ব্যয় (টাকা)
আওয়ামী লীগ	৪১	৭,৫২,৮০১	৪,০০,৮৩২	১,২৩,৭৭,১৩০	১,৩৩,৬৫,৫১৫
বিএনপি	৪৩	৩,৫৮,৪১০	৯৬,৯৮৯	২৮,০৪,৯৯০	২৭,৮৫,১২২
জাতীয় পার্টি	৮	৫৫,৯৭৫	৫৮,৩২৫	৬২,৬০,১৯৮	৬৩,৪৬,৫১১
গণ ফোরাম	৫	-	৫৬,০০০	৪০,৭৯,৫৮০	৪১,৩৫,৫৮০
স্বতন্ত্র	৩	৭,৮৭০	১,৭৭,৬৬৬	১৪,২৩,৯০৫	১৬,০৪,১৯৫
অন্যান্য*	৭	১,৭৭,৩৬০	১,২৩,০১৪	১,২১,৫৮,১৭১	১,২৪,০৭,৮৭১
মোট	**১০৭**	**৫,৫৩,৬৯৮**	**২,১৪,৭৭৫**	**৭৪,৯৫,৩৮৮**	**৭৭,৬৫,০৮৫**

* অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় পার্টি (জেপি), এলডিপি, জেএসডি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা সংক্রান্ত টিআইবি'র গবেষণায় দেখা যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমার প্রায় তিনগুণ ব্যয় করেছিলেন - নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমা যেখানে ছিল আসনপ্রতি সর্বোচ্চ ১৫ লাখ টাকা, প্রার্থীরা ব্যয় করেছিলেন গড়ে ৪৪ লাখ ২০ হাজার ৯৭৯ টাকা।

৫.২.৩. নির্বাচন অনুষ্ঠান

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর ২৯৯টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনের দিন সারা দেশের ২৪ জেলায় নির্বাচনী সহিংসতার ফলে ১৮ জনের প্রাণহানি ঘটে, এবং ২০০ জন আহত হয়। মৃতদের মধ্যে আটজন আওয়ামী লীগ ও চারজন বিএনপি'র কর্মী ছিল বলে দাবি করা হয়। মোট ২২টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৯৪% আসনে নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনিয়মের ধরনের মধ্যে নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে রাখা, আগ্রহী ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো বা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া, বুথ দখল করে প্রকাশ্যে সিল মেরে জাল ভোট দেওয়া, ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা, ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগেই ব্যালট পেপার ভর্তি বাক্স, ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া, এবং প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া উল্লেখযোগ্য (সারণি ৪ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ৪: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম

অনিয়মের ধরন	আসন (%)
প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর নীরব ভূমিকা	৯১
জাল ভোট দেওয়া	৮৯
নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে রাখা	৭২
বুথ দখল করে প্রকাশ্যে সিল মেরে জাল ভোট	৬৫
পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া ও কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া*	৬৩
ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া	৫৭
ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা	৫৭
ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া	৪৮
আগ্রহী ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো	৪৬
ব্যালট বাক্স আগে থেকে ভরে রাখা	৪৪
প্রতিপক্ষ দলের প্রার্থীর নেতা-কর্মীদের মারধর করা	২৪

* এর মধ্যে ২৯টি আসনে পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে, ১০টি আসনে কোনো এজেন্ট ছিল না।

সারাদেশে বেশিরভাগ কেন্দ্র আওয়ামী লীগসহ মহাজোটের নেতা-কর্মীদের দখলে থাকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বেশিরভাগ কেন্দ্রে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট ছিল না, অথবা সকালে তাদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে ৭৬ প্রার্থী নির্বাচন চলাকালীন ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। তবে ঐক্যফ্রন্টের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৫.৩. নির্বাচন-পরবর্তী সময়

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে আওয়ামী লীগ ৪০, জাতীয় পার্টি ৬, বিএনপি ১, গণ ফোরাম ২, অন্যান্য দল একটি আসনে জয়ী হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ২৫৭, জাতীয় পার্টি ২২, বিএনপি ৫, গণ ফোরাম ২, স্বতন্ত্র ৩, অন্যান্য দল ৯ আসনে জয়ী হয়। তবে দেখা যায় ১৮৬টি আসনে ভোট দেওয়া হয়েছে ৮০ শতাংশের বেশি - এর মধ্যে ১৩টি আসনে ভোট ৯০ শতাংশের ওপরে; অন্যদিকে ৫০ শতাংশের নিচে ভোট পড়েছে তিনটি আসনে।

নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোট, যাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট, সিপিবি, খেলাফত মজলিস, বাসদ, গণ সংহতি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য। নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচন কমিশনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট স্মারকলিপি প্রদান করে ২০১৯ সালের ৩ জানুয়ারি। বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী 'পর্যবেক্ষক'রা নির্বাচন "অংশগ্রহণমূলক" হয়েছে বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও গণ-মাধ্যমে নির্বাচনে অনিয়মের সমালোচনা করা হয়েছে।

তবে এসব অভিযোগ সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে বলে দাবি করে হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য অনুযায়ী "কিছু জায়গায় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সার্বিক পরিস্থিতি ভালো"। অন্যদিকে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক' ছিল। পরবর্তী সময়ে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন থেকে বক্তব্য দেওয়া হয়।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে জয়ী প্রার্থীরা গড়ে ১ কোটি ২৭ লাখ ৩৩ হাজার ৮৭৭ টাকা ব্যয় করেছেন বলে প্রাক্কলিত হয়েছে। এর মধ্যে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৪ কোটি ৫৫ লাখ ৬৯ হাজার ৫০০ টাকা, এবং আরেকজন প্রার্থী সর্বনিম্ন ২ লাখ ৮৬ হাজার ৭০০ টাকা ব্যয় করেছেন।

৫.৩.১.নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল

আইন অনুসারে নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর নির্বাচন কমিশনে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর দুই মাসের বেশি সময় পার হয়ে গেলেও প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব বিবরণীর কোনো সত্যায়িত অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে এসে পৌঁছায়নি বলে জানা যায়। প্রার্থীদের ব্যয়ের হিসাব চেয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে চিঠিও পাঠায়নি নির্বাচন কমিশন।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে কতজন নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন জমা দিয়েছেন সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া না গেলেও তাদের মধ্যে ২১টি আসনের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪৫ জনের মধ্যে ৪০ জন প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন জমা দিয়েছে বলে জানা যায়। এই ৪০ জনের ব্যয়ের রিটার্ন পর্যালোচনা করে দেখা যায় কোনো প্রার্থীই তাদের রিটার্নে ২৫ লাখ টাকার বেশি ব্যয় দেখান নি, যদিও গবেষণার প্রাক্কলনে দেখা যায় প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৫৭.৯% প্রার্থী। ব্যয়ের রিটার্ন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের গড় ব্যয় ১৫ লাখ ১৫ হাজার ৪৮৪ টাকা, যা ঐসব আসনে গড় সর্বোচ্চ ব্যয়সীমার চেয়ে অনেক নিচে, যদিও এই গবেষণার প্রাক্কলন অনুযায়ী এই ৪০ জনের নির্বাচনী ব্যয় গড়ে ৭৯ লাখ ৭২ হাজার ৮৭৬ টাকা, যা ঐসব আসনে গড় সর্বোচ্চ ব্যয়সীমার চেয়ে তিনগুণেরও বেশি। এই ৪০ জনের মধ্যে একজন সর্বনিম্ন ব্যয় দেখিয়েছেন ৭১ হাজার ৩০০ টাকা, এবং সর্বোচ্চ ব্যয় একজন দেখিয়েছেন ২৫ লাখ টাকা (সারণি ৫)। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রার্থীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রকৃত নির্বাচনী ব্যয় গোপন করেছেন।

সারণি ৫: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের* রিটার্নে প্রদর্শিত নির্বাচনী ব্যয় (টাকা)

	রিটার্নে প্রদর্শিত ব্যয়	তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয়
গড় ব্যয়	১৫,১৫,৪৮৪	৭৯,৭২,৮৭৬
সর্বনিম্ন ব্যয়	৭১,৩০০	৬৫,০০০
সর্বোচ্চ ব্যয়	২৫,০০,০০০	৪,৫৫,৬৯,৫০০

* ৪০ জনের রিটার্নে প্রদর্শিত ব্যয় এবং এই ৪০ জনের নির্বাচনী ব্যয়ের প্রাক্কলন।

চিত্র ৩: প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে প্রদর্শিত ব্যয়ের সাথে প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনা

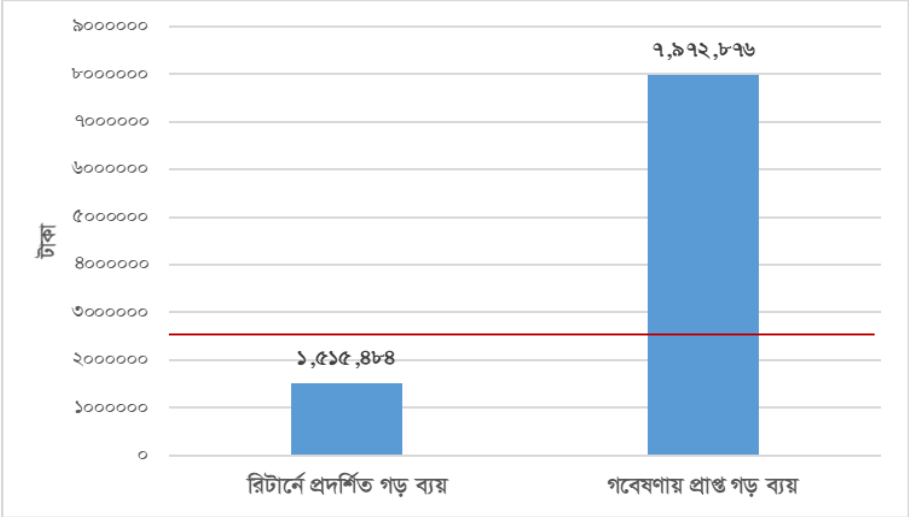

* লাল রেখাটি নির্বাচন কমিশন আসনপ্রতি নির্ধারিত সর্বোচ্চ ব্যয় নির্দেশ করছে।

৬. একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা

৬.১. ক্ষমতাসীন সরকার

ক্ষমতাসীন দল/ জোটের কোনো কোনো কার্যক্রম নির্বাচনকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে বলে দেখা যায়। এসব কার্যক্রমের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমর্থক গোষ্ঠী সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য প্রণোদনা, নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীন সরকার বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়ার ঘোষণা, নির্বাচনের প্রায় একবছর আগে থেকেই ক্ষমতাসীন দল বিভিন্ন মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা, এবং প্রশাসন ও পুলিশের দলীয়করণ উল্লেখযোগ্য। এসব কার্যক্রম অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের

জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ভূমিকাই পালন করে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল ও জোটকে বেশ কিছু সুবিধা দিয়েছে বলে দেখা যায়।

৬.২. নির্বাচন কমিশন

একাদশ সংসদ নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশন কৃতিত্বের দাবিদার। প্রয়োজনীয় সব কার্যক্রম বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় নির্বাচন কমিশন, যার মধ্যে সুষ্ঠু ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের জন্য প্রযোজ্য নির্বাচনী আচরণ বিধি সংশোধন, মনোনয়নপত্র বাতিলের পর শুনানিতে প্রার্থিতা ফেরত, ভোটার তালিকা ছাপানো, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সরবরাহ, দল ও প্রার্থীর জন্য প্রতীক বরাদ্দ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে এই নির্বাচন আয়োজন করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন যেসব বিতর্কের জন্ম দিয়েছে তার মধ্যে মনোনয়নপত্র বাতিল করা, সবার জন্য সমান ক্ষেত্র তৈরিতে ব্যর্থতা, ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি, নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, তথ্য প্রবাহের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা নিয়ন্ত্রণ করায় ব্যর্থতা, এবং প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন সংক্রান্ত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত না করা, নীতিমালা ও আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৬.৩. রাজনৈতিক দল ও জোট

প্রার্থিতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দলীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি থেকে মনোনীত হয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে চূড়ান্ত মনোনয়ন পাওয়ার প্রক্রিয়া কোনো দলের ক্ষেত্রে দেখা যায় নি। আর মনোনয়নে তৃণমূলের অংশগ্রহণ না রাখার সুযোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে মনোনয়ন-বাণিজ্যের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এছাড়া দলীয়ভাবে কোনো কোনো নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন করা হয়, এবং প্রধান দুই জোটের বিরুদ্ধেই নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ তোলে অন্যান্য দল।

৬.৪. প্রার্থী

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী আইন ও আচরণ বিধি লঙ্ঘনের সাথে সাথে প্রচারণার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আসনপ্রতি নির্ধারিত ব্যয়সীমার চেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন প্রার্থীরা, এবং এর ফলে সম্ভাব্য আইনপ্রণেতাদের মধ্যে আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে অনীহা দৃশ্যমান হয়েছে। প্রার্থীরা যেসব ক্ষেত্রে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেন তার মধ্যে হলফনামায় তথ্য না দেওয়া, নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয়, প্রচারণায় আচরণ বিধি লঙ্ঘন, এবং নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল না করা উল্লেখযোগ্য।

৬.৫. নাগরিক সমাজ

বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ও মতামত প্রদান অব্যাহত ছিল। এসব আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে নির্বাচন কমিশন, সরকার, ক্ষমতাসীন দল ও জোট এবং বিরোধী দল ও জোটের কার্যক্রম ও করণীয়, নির্বাচনের প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের অনিয়ম ও আইনের ব্যত্যয়, নির্বাচনকালীন সরকারের কাঠামো, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও করণীয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরে নির্বাচনের বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত বক্তব্য পাওয়া যায়, এবং খুব কম সংখ্যক ব্যক্তির কাছ থেকে সরাসরি প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়।

৬.৬. নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই পূর্বের নির্বাচনগুলোর তুলনায় সবচেয়ে কম সংখ্যক আন্তর্জাতিক ও দেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা নির্বাচনের দিন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলগুলোর পক্ষ থেকে নির্বাচনের দিনই সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং সুশৃঙ্খল হয়েছে বলে মত প্রকাশ করা হয়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে নির্বাচন হয়েছে বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়, এবং সহিংসতার ঘটনাগুলোকে দুর্ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ তাদের বক্তব্যে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে কোনো পর্যবেক্ষকের প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয় নি।

৬.৭. সংবাদ-মাধ্যম

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়ায় সংবাদ-মাধ্যম বিশেষকরে প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়া একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে দলীয় ও প্রার্থীর প্রচারণা সংক্রান্ত গতানুগতিক সংবাদ প্রচারের ধারার বাইরে গিয়ে প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন দলের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ এবং এর ওপর বিশ্লেষণ, মন্তব্য প্রতিবেদন, বিশেষ ক্রোড়পত্র, প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা, এবং আসনগুলোর ওপর মৌলিক তথ্য প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি পর্যবেক্ষণ করে সচিত্র তথ্য প্রকাশ করা হয়। এর সাথে সাথে নির্বাচন কমিশন, ক্ষমতাসীন সরকার, বিরোধীদলীয় জোট ও দলের বিভিন্ন বিতর্কিত কার্যক্রম ও ভূমিকা নিয়ে নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ করা হয়, এবং

সম্পাদকীয় ও মন্তব্য কলামে প্রতিবেদন ও কলাম প্রকাশিত হয়। প্রথম সারির সংবাদপত্রগুলোতে নির্বাচনের দিনের অনিয়ম বিভিন্ন আসন ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করা হয় এবং বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়।

ইতিবাচক ভূমিকার পাশাপাশি নির্বাচন-সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু বিতর্কিত ভূমিকা লক্ষ করা যায়, যেমন বিভিন্ন দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে প্রচারিত সংবাদ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন টক শো'র তথ্যে বস্তুনিষ্ঠতার ঘাটতি ইত্যাদি। নির্বাচনের আগে এবং পরে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ওপর সংবাদ প্রচারে কয়েকটি বেসরকারি চ্যানেল রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ পরিবেশন করে। প্রতিটি বেসরকারি চ্যানেলই প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারা দেশের বিভিন্ন এলাকার ওপর প্রতিবেদন ও সংবাদ এবং নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করে। নির্বাচনের দিনে ভোট কেন্দ্র থেকে সরাসরি খবর সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় নির্বাচনী খবরের বস্তুনিষ্ঠতা অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

৭. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখা যায় নির্বাচন পরিচালনা করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন অনেকক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয় নি। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেয় নি। সব দলের সভা-সমাবেশ করার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিল না। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের দমনে সরকারের ভূমিকার প্রেক্ষিতে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন নীরবতা পালন করেছে বা ক্ষেত্রবিশেষে অস্বীকার করেছে। সব দল ও প্রার্থীর প্রচারণার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে পারে নি, এবং একইসাথে সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করতে পারে নি নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনী অনিয়ম ও আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিশেষকরে সরকারি দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার উদাহরণও তৈরি করতে পারে নি। এর ফলে নির্বাচন কমিশন যেমন সব দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করতে পারে নি, আবার অন্যদিকে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' আছে কি না তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ পেয়েছে, যা নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থার ঘাটতি তৈরি করেছে।

নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সংবাদ-মাধ্যমের জন্য বেশ কয়েকটি নিষেধাজ্ঞার কারণে কমিশনের নিয়ন্ত্রণ ছিল কঠোর। নির্বাচনের সময়ে ইন্টারনেটের গতি হ্রাস করা হয়, এবং মোবাইল ফোনের জন্য ফোর-জি ও থ্রি-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখা, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মোটরচালিত যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ নির্বাচনের স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

ক্ষমতাসীন দল/ জোটের কোনো কোনো কার্যক্রম নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে বলে দেখা যায়। সংসদ না ভেঙ্গে নির্বাচন করার ফলে সরকারে থাকার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করা ক্ষমতাসীন দল ও জোটের জন্য সহজ হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমর্থক গোষ্ঠী সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে, এবং নির্বাচনমুখী অনেক প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের প্রায় একবছর আগে থেকেই ক্ষমতাসীন দলের প্রচারণা লক্ষ করা যায়, যেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রমের সাথে প্রচারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের মাধ্যমে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, যা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে গেছে। এমনকি সংলাপে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেওয়ার পরও নির্বাচনের সময় পর্যন্ত ধরপাকড় ও গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া সরকারবিরোধী দলের নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেওয়া, প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, সহিংসতার কারণে বিরোধী দল প্রচারণায় অনেকখানি অপারগ ছিল।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের প্রবণতা লক্ষণীয়। বিভিন্ন ধরনের লঙ্ঘনের সাথে সাথে প্রচারণার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আসনপ্রতি নির্ধারিত ব্যয়সীমার চেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন প্রার্থীরা, এবং এর ফলে সম্ভাব্য আইনপ্রণেতাদের মধ্যে আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে অনীহা দৃশ্যমান হয়েছে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের ফলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'অংশগ্রহণমূলক' বলা গেলেও তা 'প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ' হতে পারে নি।

৮. সুপারিশ

১. সৎ, যোগ্য, সাহসী ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

২. দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার স্বার্থে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ অন্যান্য অংশীজনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ হতে হবে।

৩. একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগসহ নির্বাচনী আচরণ বিধির বহুমুখী লঙ্ঘনের যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে ও তার ওপর ভিত্তি করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে তাদের ব্যর্থতা নিরূপণ করে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। অন্যদিকে কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপের পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ আমলে নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের উদ্যোগ নিতে হবে।

৫. নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ (ভোটার তালিকা হালনাগাদ, মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র উত্তোলন ও জমা, প্রার্থীর আর্থিক তথ্য যাচাই, নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল ইত্যাদি) ডিজিটালাইজ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও প্রার্থীর মনোনয়ন প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৬. নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও গণ-মাধ্যমের তথ্য সংগ্রহের জন্য অবাধ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

****